প্রথম অধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন ও উপন্যাস লেখা প্রসঙ্গে

শতবর্ষের সীমানা আর স্পর্শ করা হল না। বাকি ছিল মাত্র কয়েক মাস। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো এক মহাজীবনের অবসান ঘটেছে। মননশীলতা ও জীবনধারণের বিশালতায় তিনি বিশ শতকের বাঙালি সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবসমাজের সত্যসন্ধানী প্রাণপুরুষ। তাঁর জীবনচর্যাকে এক মহাজীবন বলতে হয়। ব্যক্তিজীবনের দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতা অন্নদাশঙ্করকে সাহিত্যিক হিসেবে, জীবনশিল্পী হিসেবে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো স্মরণীয় ও বরণীয় করে তোলে। তাঁর জীবন, জীবনশিল্প আমাদের ভাবায়। মানুষের জীবনধারা, জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কার-কুসংস্কার, শোষণ উৎপীড়নের ঘাত-প্রতিঘাত মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তারই প্রতিফলন ঘটে তাঁর লেখনীতে।

ওড়িশার দেশীয়রাজ্য ঢেঙ্কানাল-এ ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ একটি অতিপুরাতন শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অন্নদাশঙ্কর রায়। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর তাঁর বাবা নিমাইচরণ রায় ও মা হেমনলিনী দেবী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। বাড়িতে গৌরগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তাঁর বয়স সাত-আট বছর। ছোটোকাকা হরিশ্চন্দ্র রায় তাঁকে মাত্র নয় বছর বয়সে বিদ্যালয়ের পুরস্কার সভায় টেনিসনের *The Charge of The Light Brigade* কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ করে দেন। তিনি তখন ইংরেজি অল্প বুঝলেও কবিতাটি অসম্পূর্ণ আবৃত্তি করেও একখানা ইংরেজি বই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছোটোবেলায় বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' ছিল তাঁর জীবনের নিরাময়। কিন্তু বাংলা শিক্ষার চর্চা করতে হত। বাংলা শিক্ষার জন্য কোনো পাঠশালা বা বিদ্যালয় ছিল না। বাংলা পড়তে শিখতেন বাড়িতেই। বটতলার *শিশুবোধক*, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *হাসিখুশি* দিয়ে বাংলা পড়ার পর্ব শুরু হয়। সেজকাকা কলকাতা থেকে *শিশু* পত্রিকার গ্রাহক করে দেন। পড়তে পড়তে অন্নদাশঙ্করের মনে লেখার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। একটা নতুন জগতের আভাস পান। এখানে যেন তিনি দুনিয়ার অনেক খবরাখবর পেয়ে যান। *প্রভা* নামে ওড়িয়া ভাষায় ছোটোদের একটি মাসিকপত্র নিজের হাতে লেখেন। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মায়ের গাওয়া *গীতগোবিন্দ*-এর একটি না একটি গান শুনতেন। বাবার কাছে শুনতেন বিদ্যাপতি থেকে আবৃত্তি করা কয়েকটি পদ। অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য সৃষ্টিতে ছন্দ মিলের ধারণা পেয়েছিলেন জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* ও বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে।

তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত বাংলা ভাষায় পদাবলী কীর্তন হত। খোল বাজিয়ে গান করতেন স্থানীয় ওড়িয়ারা। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে সংস্কৃতিচর্চার একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। অন্নদাশঙ্করের পরিবার আচারনিষ্ঠ হিন্দু হলেও বাড়িতে মুসলমান, খ্রিস্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সবাই আসতেন। সর্বধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁর বাবা নিমাইচরণ ও পাবর্তীবাবু দু'জনে মিলে *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। ফলে পরিবারে সাহিত্যচর্চা ও বাংলা ওড়িয়া ভাষার সেতুবন্ধন শৈশবে স্বচক্ষে দেখেছেন। রাজবাড়িতে গিয়ে রংমহলে থিয়েটারও দেখতেন। একদিন তিনি *মুকুট* নাটকের ধুরন্ধরের পার্টে অভিনয়ও করেছিলেন। একদিন বাবা তাঁকে আলমারির একটি চাবি দেন। সেই আলমারিতে অনেক বইয়ের মধ্যে ছিল *বসুমতী* গ্রন্থাবলী। *বসুমতী* তিনি নিয়মিত পড়তেন। খাবারের চেয়ে খবর ছিল তাঁর কাছে বেশি লোভনীয়। তাঁর বাবা ছিলেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত ও উদার মানসিকতার। কিন্তু তখনকার দিনে অনেক ভদ্রমহিলাই থাকতেন অন্তঃপুরে। হেডমাস্টারের স্ত্রী, প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী, রাখাল বাবুর স্ত্রী, নিতাই বাবুর স্ত্রী— এদের কাউকেই অন্নদাশঙ্কর চাক্ষুষ দেখতে পারেননি। যদিও এদের বাড়িতে অনেকবার গেছেন। এরা সকলেই ছিলেন পর্দানশীন। তিনি ছোটোবেলাতেই নারীর এই পর্দানশীন ব্যাপারটিকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। ছোটোবেলা থেকেই ফলতে থাকে অভিজ্ঞতার ফসল।

ঢেঙ্কানালের যে বিদ্যালয়ে অন্নদাশঙ্কর পড়তেন সেই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকেরা ছিলেন পরম্পরাক্রমে বাঙালি। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অনেক ইংরেজি বই ছিল যার অধিকাংশই ছাত্রদের কাছে দুর্বোধ্য। প্রধানশিক্ষকের দৌলতে গ্রন্থাগারে অনেক বই ও কমনরুমে অনেক বাংলা পত্রিকা এনে রাখা হত। প্রধানশিক্ষক রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় তাকে দেন কমনরুমে পত্রিকাগুলি দেখাশুনার দায়িত্ব। তিনি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পত্রিকাগুলি পড়তেন। সেখানেই আবিষ্কার করেন *সবুজপত্র* পত্রিকা। চিন্তার জগতে *সবুজপত্র* ঢেউ তোলে। পত্রিকাটির সুবাদে চিনে নেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে। রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে *প্রবাসী* পুরাতন ভাঙা সেট দেখতে পান। *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত *গোরা* উপন্যাসটির ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো জুড়ে কাহিনি বোঝার চেষ্টা করেন। *সবুজপত্র* পত্রিকাতেই পড়েন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গল্প। রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। *প্রবাসী*-র অন্যান্য সংখ্যাও পড়তে থাকেন, গ্রাহকও হন। বাংলা উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যে গদ্যশৈলী ব্যবহার করেছেন তার প্রথম ধারণা পেয়েছিলেন *সবুজপত্র*-এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর *চার ইয়ারি কথা*-য়। আসলে সাহিত্য সম্পর্কে

ধারণা গড়ে ওঠার নমুনা তার সামনেই ছিল। শুধু আর্টের গুরুগৃহে উপনয়ন হয়ে গেল। তাঁর দু'জন আদিগুরুর নাম বলতে গেলে অনায়াসেই উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর নাম। এখান থেকেই তাঁর সাহিত্যিক হওয়ার শিক্ষানবিশির শুরু। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—

> ''সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা 'চার ইয়ারি কথা' আমার খুব ভাল লেগেছিল। আর বীরবল নামে কে একজন লিখতেন, তাঁর লেখাও আমার খুব পছন্দ হয়। জানতুম না যে বীরবলই প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম। বীরবলী ভাষাতেই আমি বাংলা লিখতে চেষ্টা করি। টলস্টয়ের 'তেইশটি উপকথা'-র ইংরেজি অনুবাদ যখন পুরস্কার রূপে পাই তখন তার একটি কাহিনী বীরবলী ভাষাতে তর্জমা করে 'প্রবাসী'তে পাঠাই। সেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সেটিই আমার প্রথম মুদ্রিত রচনা।''[১]

বাংলায় এই অনুবাদমূলক রচনার পূর্বেই ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। প্রাচীন বাঙালি শাক্তপরিবারে জন্মেছিলেন, শৈশব কেটেছে ওড়িয়া সমাজে এবং সাহিত্যিক জীবন ও কর্মজীবন বঙ্গদেশে। তাই ওড়িয়া ও বাংলা সাহিত্য সাধনার স্রোত বয়েছিল অন্নদাশঙ্করের মধ্যে। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হলেও ওড়িয়া ভাষাতেই তাঁর হাতেখড়ি। পাটনা কলেজে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হওয়ার সময়ই তিনি *সৃজন স্বপ্ন* ও *প্রলয় প্রেরণা* নামে দুটি কবিতা লিখে ওড়িয়া সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নতুন প্রতিভাধর সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত হন। ওড়িয়া সমাজে আলোড়নের ঢেউ ওঠে তাঁর হাত ধরে। তিনি *উৎকল সাহিত্য* পত্রিকায় তিনটি খোলা চিঠি লেখেন। প্রথমটি *প্রভাতী তারা*-র উদ্দেশ্যে লেখা। তাতে তিনি নারীর স্বাতন্ত্র্য, অধিকার সম্বন্ধে জনমত গঠন করেন। দ্বিতীয়টি বিবাহের আদর্শ ও তৃতীয়টি ওড়িয়া সাহিত্যে কীভাবে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে আসা যায়। *সবুজ কবিতা* নামে ওড়িয়া ভাষায় কাব্য সংকলনটি ছিল পাঁচজন বন্ধুর লেখা কবিতার সমষ্টি। *সবুজ কবিতা*-য় সবচেয়ে বেশি ছিল অন্নদাশঙ্করের কবিতা। এঁরা ওড়িয়া সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেন যা *সবুজযুগ* নামে পরিচিত। ওড়িয়া ভাষায় এর পূর্বে *সবুজ* শব্দটি ছিল না। অন্নদাশঙ্কর রায় সবুজ শব্দটিকে সংযোজন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত *সবুজপত্র* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *সবুজের অভিযান* কবিতা থেকে। এছাড়া তিনি ওড়িয়া ভাষায় *সহকার* পত্রিকায় বঙ্গোৎকল ছদ্মনামে লিখে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি একই সঙ্গে রক্তসূত্রে বাঙালি ও জন্মসূত্রে ওড়িয়া। ক্রমশ বুঝতে পারেন বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষায় সাহিত্য রচনার অসম্ভব্যতা ও দুরূহতা। লিখতেন ইংরেজিতেও। শেষ পর্যন্ত তিনি বেছে নেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য

রচনার দায়িত্ব। তিনি লিখেছেন—

> ''আমার ওড়িয়া লেখা উনিশশো একুশ সালে আরম্ভ হয়ে উনিশশো ছাব্বিশেই শেষ হয়ে যায়। আমি হৃদয়ঙ্গম করি যে তিনটে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে আমি কোনও ভাষাতেই বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। সুতরাং একটি ভাষাকেই বেছে নেওয়া উচিত। আমি বেছে নিই বাংলা।''[২]

তাঁর হাতে যেন চলে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীর উত্তরাধিকার পালনের গুরুদায়িত্ব। ১৯২৫-এ ইংরেজিতে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এই সময় টলস্টয় তাঁর মন অধিকার করে বসে। টলস্টয়ের প্রতি কি যেন একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেন। কলেজে পড়ার সময় টলস্টয়ের *আনা কারেনিনা* পড়েন। গ্রন্থটি তাঁর চিন্তায় উপন্যাস সম্পর্কে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। উপন্যাস সম্পর্কে *গোরা* ও *ঘরে বাইরে*-র গণ্ডী অতিক্রম করে টলস্টয় হয়ে ওঠেন তাঁর কাছে অন্যতম সাহিত্যগুরু। টলস্টয়ের উপন্যাস হয় তাঁর জীবনের আদর্শ। তাঁকে পরিবারের লোকদের সামনে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনাতে হত। ফলস্বরূপ মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্তের মতো চরিত্রকে বুঝতে পেরেছিলেন। উপন্যাসের আভাস কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

> ''মুকুন্দরাম অনেকগুলি চিত্র এঁকেছেন সেকালের বাঙালিদের। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দুটি উপাখ্যানকে দুটি উপন্যাসও বলতে পারা যায়।''[৩]

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* ও পড়েছিলেন। *অন্নদামঙ্গল* পড়ে একদিকে কায়স্থদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, অন্যদিকে খুঁজে পান বাংলা ছন্দ ও শিল্পকে, পরিচয় ঘটে অনেক আরবি ফার্সি শব্দের সঙ্গে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অনেক কঠিন ইংরেজি বই ছিল। সেগুলির থেকে ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলি পড়তেন। তাছাড়া পড়েছিলেন স্কট ও ডিকেন্সের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। *What Every Youngman Out to Know* বইটি পড়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে বাবার কাছে প্রথম জানলেন নারী-পুরুষের মিলনে সৃষ্টি রক্ষিত হয়। অন্নদাশঙ্করের জিজ্ঞাসু মন ছোটোবেলা থেকেই ছিল। বাবার কাছ থেকে শোনা সৃষ্টি সম্পর্কে এই ধারণা তাঁর চিন্তার জগতকে আলোড়িত করে এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যিক জীবনে তা ব্যাপক সহায়ক হয়ে ওঠে। বনস্পতি যেমন ছোটো ছোটো কচিপাতা দুটোকে ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে একসময় বৃহৎ হয়ে ওঠে অন্নদাশঙ্করকেও সাহিত্যিক হওয়ার পেছনে জীবন থেকে শেখা অভিজ্ঞতাই গড়ে তুলেছে ধীরে ধীরে। পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক জগতে বিচরণকারী নানা চরিত্র, বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ থেকে পাওয়া নানান

জ্ঞান ও তথ্য— সমস্ত মিলে তাঁকে গড়ে তুলেছে। জীবনপথে কিছু ঘটনা, ঘটে যাওয়ার প্রত্যক্ষ দৃশ্যজাত অভিজ্ঞতা— সবই এক একটা উত্তরণ চিহ্ন, ব্যক্তিত্ব গড়ার উপাদান। জীবনের কাছ থেকেই তিনি শেখেন জীবনের মূল্য, হিংসার বিরুদ্ধে জাগরণ, ধর্মে ধর্মে ধনী গরিবে ইংরেজি বাংলায় ভেদাভেদহীনতা। জীবনদৃষ্টির উৎসসন্ধান তার এখানেই। তারপর পরিব্যাপ্তি ও সাহিত্যে প্রতিফলন।

অন্নদাশঙ্করের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা এবং বড়জোর দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা অবধি চর্চা হত। কিন্তু তিনি ছিলেন এর থেকে আরও এগিয়ে। তাঁর জীবনের গতি নির্ধারণ করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও সবুজপত্রের প্রভাব। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই দেশ বা স্বদেশিয়ানা ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান। এক্ষেত্রেও বাবার অবদান অসামান্য। বাড়িতে বিলিতি কাপড়ের পরিবর্তে মিলের কাপড় কেনা হত। তাঁত বুনে খাওয়া মানুষদের প্রতি সহৃদয় হতে তাঁর বাবা দু'টাকার উপর চার আনা বেশি দিয়ে তাঁতের কাপড় কিনতেন। তখন থেকে সবাই বাড়িতে তাঁতের কাপড় পড়তেন। ১৯২১-এর অসহযোগের পর থেকে পড়তেন খদ্দর। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তাঁর মনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব পরে। পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। মাস্টারমশাইয়ের অনুরোধে পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল করতে পারেননি। কেননা পরীক্ষার দিন সকালেও *Modern Review* পত্রিকা পাঠ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল আমেরিকা গিয়ে জার্নালিস্ট হওয়া। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসও পড়েছিলেন। যে সকল ভারতীয় আমেরিকায় থাকতেন তাঁদের লেখা *প্রবাসী* ও *Modern Review* পত্রিকায় পড়তেন। পাবনা থেকে প্রকাশিত *সার্চলাইট* পত্রিকায় পড়েছিলেন Eternal Vigilance is the Price of Liberty' (John Curran). এটা অন্নদাশঙ্করেরও মূলমন্ত্র ছিল। আসলে দেশ দেশের মানুষ তাদের স্বাধীকার নিয়ে তাঁর একটা ভাবনার পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়—

> ''আমার অন্বিষ্ট ছিল বিলিতি লোককথার রাজা আর্থারের মতো তরবারি, বিকল্পে লেখনী। মনেপ্রাণে আমি একজন নাইট। আমার কাজ বিপন্নের উদ্ধার। ইংরেজিতে যাবে বলে শিভালরি।''[৪]

বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে আমেরিকায় গিয়ে সংবাদপত্রের শিক্ষানবিশি করা হয় না। ছোটোকাকার কথামত কটকের Ravenshaw College-এ পড়াশোনা শুরু করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছেটা ছিলই। বি.এ. পড়া শেষ করে কলকাতায় ফিরে সাংবাদিক হতে আর সুবিধা অনুযায়ী আমেরিকায় গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কলম ধরতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কলমকেই তরোয়াল হিসেবে বেছে নিয়েছেন একজন দেশপ্রেমিকের আন্তরিক তাগিদ থেকে।

ওড়িয়া ভাষায় লেখা *কমলবিলাসীর বিদায়* কবিতাটি রচনা তাঁর ওড়িয়া সাহিত্য থেকে বিদায়। সময়কাল ১৯২৬। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ওড়িয়া ভাষায় হাতে খড়ি। *সবুজ দল* এর পাঁচজন লেখক ওড়িয়া ভাষায় *বাসন্তী* নামে একটি বারোয়ারি উপন্যাস রচনার সংকল্প নেন। কথা ছিল বারোমাসে বারোজনে লিখবেন। অন্নদাশঙ্করেরা পাঁচজন লেখক ছিলেন। বৈকুণ্ঠ আবার কবিতা ছাড়া কিছু লিখবেন না। কালিন্দী *উৎকল সাহিত্য*-এর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ জানান ইচ্ছুক লেখকদের। অন্নদাশঙ্কর নিজেই তিন মাসের জন্য তিনটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। উপন্যাস লিখতে সক্ষম এমন একজন লেখিকার সন্ধান পাওয়া গেল। উনি হলেন সরলা দেবী। সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচিত না হলে *বাসন্তী* উপন্যাস লেখা হত না। আবার *বাসন্তী* উপন্যাস না লিখলে সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচয়ও হত না। এই উপন্যাস শেষ পর্যন্ত ঊনত্রিশটি পরিচ্ছেদে হয়। তার মধ্যে ন'টিই একা সরলা দেবীর। চারটি পরিচ্ছেদের বেশি কেউ লেখেননি। অন্নদাশঙ্কর রায় নিজে লিখেছেন মাত্র তিনটি পরিচ্ছেদ। উপন্যাস লেখার পরও সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলতে থাকে। পত্রালাপ প্রথমে ওড়িয়া ও পরে বাংলা ভাষাতে চলতে থাকে। সেসব পত্র প্রায়ই প্রবন্ধের আকার নিত। পত্রালাপে গদ্যের ভাষা ও শৈলীর চর্চা হয়ে যায় যা উপন্যাস রচনার জন্য প্রয়োজন ছিল। সরলা দেবীর নারী হৃদয়ের কথা, সমাজসত্তার সঙ্গে নারীসত্তার যে দ্বন্দ্বের কথা তিনি জেনেছিলেন তা পরবর্তীকালে *রত্ন ও শ্রীমতি* উপন্যাস রচনায় কাজে লেগেছে। নারীর বন্ধনমুক্তি কতটা প্রয়োজন সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচয় না হলে লেখক জানতে পারতেন না।

১৯২১-১৯২৭ সাল দেশে ছ'বছর এবং ১৯২৭-১৯২৯ সাল বিদেশে দু'বছর— এই আটটি বছর ছিল অন্নদাশঙ্করের জীবননির্মাণের কাল। দেশ-কাল সম্পর্কে ধারণা ও সত্যের অনুসন্ধান সাধনার ব্রত নিয়ে একজন জীবনশিল্পী হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করেছেন আজীবন। কিন্তু এই আট বছর ছিল তার প্রধান ভিত্তিভূমি। তিনি প্রথম বছর আই.সি.এস পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করলে ভারত সরকার শিক্ষানবিশিতে গ্রহণ না করায় দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সময়টা ছিল ১৯২৭ সাল। ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে দুই সতীর্থ দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার ও হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দু'বছর প্রশিক্ষণের জন্য বিলেত যাত্রা করেন। শুরু হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *পথে প্রবাসে (১৯৩১)* লেখা। প্রথম লাইনেই একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক হওয়ার সম্ভাবনার বীজ পরিলক্ষিত হয়। *পথে প্রবাসে* গ্রন্থের শুরু—

> ''ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি

> পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।"[৫]

প্রশিক্ষণের সময়কালে ইউরোপে বসে লিখে ফেললেন *পথে প্রবাসে* (১৯৩১) এবং তা ধারাবাহিকভাবে *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মানুষের মনে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় জীবনকে কোন পথে চালিত করবেন। এই প্রশ্ন অন্নদাশঙ্করেরও ছিল। এই প্রশ্নে তিনি জীবনে তিন বার দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে সাংবাদিকতা বনাম সাহিত্য, দ্বিতীয়বার সাহিত্য বনাম ইংরেজের দাসত্ব ও পরবর্তীকালে মানবজীবনে প্রকৃতি বনাম নৈতিকতা। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে ওঠেন একজন অহিংস সত্য ও নীতিনিষ্ঠ আর্টিস্টিক বাঙালি সাহিত্যিক। *বিচিত্রা* পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিলেত যাত্রার পূর্বেই যোগাযোগ ছিল। অন্নদাশঙ্করের লেখা *রক্তকরবীর তিনজন* নামক প্রবন্ধটি *বিচিত্রা*-র দ্বিতীয় সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। শুরু হয় বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়। সিদ্ধান্ত নেন বিলেতে বসে ভ্রমণকাহিনি লিখবেন এবং প্রকাশিত হবে *বিচিত্রা* পত্রিকায়। ফলস্বরূপ আমরা পাই *পথে প্রবাসে* প্রবন্ধ গ্রন্থ।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের একজন অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন মনীন্দ্রলাল বসু। বিলেত যাত্রার সময় কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। বিলেত পৌঁছেই তিনি মনীন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর আহ্বানে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে বড়দিনের ছুটি কাটান। মনীন্দ্রলাল বাবুর সহযোগিতায় সাক্ষাৎ ঘটে রম্যা রলাঁর সঙ্গে। তাঁর কাছে তিনি আর্ট সম্পর্কে যা জানতে পারেন তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মেলে না। অন্নদাশঙ্করের কথায়—

> ''রম্যা রলাঁকে আমি মণিদার মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আর্ট কি মানুষের প্রতিদিনের খোরাক হওয়ার পক্ষে খুব বেশি ভাল? তিনি যে উত্তর দেন তার মর্ম, অতি সাধারণ কারিগরও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী বানাত সুন্দর রূপে রেনেসাঁসের যুগে। সেটাই একালের আর্টিস্টদের আদর্শ হওয়া উচিত।"[৬]

অনেক আগেই রম্যা রলাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। অন্নদাশঙ্কর কটক কলেজে পড়ার সময়ই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *জাঁ ক্রিস্তফ* বা *জন ক্রিস্টোফার* পাঠ করেছিলেন। পাটনায় পড়াকালীন বইটি তিনি পুরস্কার হিসেবে পান। *জাঁ ক্রিস্তফ* বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক জন ক্রিস্টোফারের

মতো তিনিও আপসহীন হতে চেয়েছিলেন। জীবনে আপসহীন হতে না পারলেও সাহিত্যে হয়েছেন। *সত্যাসত্য* উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''আমি যে বৃহৎ উপন্যাস লেখায় হাত দিই এটার মূলেও রম্যা রলাঁর অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় ও গান্ধীর পরেই আমার জীবনে রলাঁর প্রভাব।''[৭]

বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে মণীন্দ্রলাল বসুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নয়, অন্তরের শ্রদ্ধাবশত ১৯৩০ সালে প্রকাশিত তাঁর *আগুন নিয়ে খেলা* উপন্যাসটি মনীন্দ্রলাল বাবুর নামে উৎসর্গ করেন। বিলেতে প্রথমে তিনি থাকতেন লণ্ডনের ক্রমওয়েল রোডের ভারতীয় ছাত্রাবাসে। লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যেখানে একসময় পড়াশোনা করতেন কার্ল মার্কস, ভ্লাদিমির লেলিনের মতো মানুষ।

ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার তথা ভালো উপন্যাস রচনার জগতে অন্নদাশঙ্কর রায় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রবেশ করেননি। এক একটি উপন্যাস রচনার মধ্যিখানেই তিনি যেমন সিদ্ধান্ত বদল করেছেন তেমনি সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন পর্বে উপন্যাস রচনায় পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়েছেন। প্রথমে কবি হতে চেয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক হওয়ার প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। পরিবেশ পরিস্থিতি জীবনাভিজ্ঞতা সাহিত্যপাঠ সম্পাদক প্রকাশকের উৎসাহে পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''আমি কবি হতেই চেয়েছিলুম, ঔপন্যাসিক হতে চাইনি। তার জন্যে কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। ইউরোপ প্রবাসের সময় পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল থেকে বিশ্বব্যাপার নিরীক্ষণ করে আমার মনে যে আলোড়ন ঘটে তারই একটা রেকর্ড রাখার কথা মাথায় আসে। কবিতা তার মাধ্যম হতে পারে না, যদি না মহাকাব্যে হাত দিই। এ যুগে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে বৃহৎ উপন্যাস। আমার চোখের সামনে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছিল। যেমন রম্যা রলাঁর *'জাঁ ক্রিস্তফ'* বা টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন'। 'জাঁ ক্রিস্তফে'র ইংরেজী অনুবাদ আমি কলেজ জীবনে পুরস্কার রূপে পাই। অবচেতন মনে তারই প্রভাব সম্ভবত সক্রিয় ছিল। তা বলে তত বড়ো উপন্যাস লেখার খেয়াল আমার ইউরোপ প্রবাস কালেও ছিল না। দেশে ফিরে আসার পরই উপলব্ধি করি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ যদি আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয় তবে আমাকে পাঁচ

বছর ধরে লিখতে হবে পাঁচ পর্বের উপন্যাস।''[৮]

বৃহৎ উপন্যাস রচনার এই ভাবনা জন্মানোর আগে তিনি একখানা ছোটো উপন্যাসও লেখেননি। প্রথমে হাত দিয়েই এতবড় উপন্যাস রচনা করা সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে তাঁর নিজের মধ্যেই সংকোচ ছিল। *বিচিত্রা* পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহে, তাড়নায় ও পরামর্শে অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই উপন্যাস রচনায় হাত দেন। উপন্যাস শিল্পী হওয়ার এক অনবদ্য প্রয়াস গড়ে উঠল। *পথে প্রবাসে* (১৯৩১) লিখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন চেষ্টা করলে একজন গদ্যশিল্পী হতে পারবেন। উপন্যাসের জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য শুরু হয়। তিনি চাইলেন *নৌকাডুবি (১৯০৬)* ও *ঘরে বাইরে (১৯১৬)* উপন্যাসের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে খণ্ডিত করতে। নারী প্রগতি সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা ছিল যা পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জাত ফসল। তিনি পরিকল্পনা করলেন বৃহৎ উপন্যাস লিখবেন এবং জীবনে এটাই হবে অমরত্ব লাভ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথমে ছোটো উপন্যাস রচনার ভাবনা থেকে পৌঁছে গেলেন বৃহৎ উপন্যাস রচনার ভাবনায়—

> ''আমার বিশ্বাস আমি ছোট একখানা উপন্যাস লিখতে পারব। সেটা হবে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ও 'ঘরে-বাইরে'র অন্তর্নিহিত তত্ত্বের খণ্ডন। হিন্দু নারী ভালবাসে স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে, সুতরাং অনায়াসেই কমলা রমেশকে ছেড়ে নলিনাক্ষকে ভালবাসে, যেহেতু নলিনাক্ষ তার প্রকৃত স্বামী। রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্বাস একেবারেই অবাস্তব। পরকীয়া প্রেমের দৃষ্টান্ত আমি একাধিক জানি। কোনও কোনওটি অত্যন্ত সুন্দর ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। সন্দীপকে একজন মেকি বিপ্লবী না করে খাঁটি বিপ্লবী করলে বিমলা কি তাকে নিখিলেশের চেয়ে ভালবাসত না? পরিণাম হত ট্র্যাজেডি। তবু সে-ও ভাল।
>
> সেই ছোট উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে আমি পৌঁছে যাই এক পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য উপন্যাসের পরিকল্পনায়। তাতে থাকবে সমসাময়িক ইউরোপের বিভিন্ন ভাবধারা তথা ভারতের চিরন্তন অন্বেষা। আমার মনে হল 'সত্যাসত্য' নামে এই এপিক উপন্যাসই হবে আমার জীবনের কাজ। এটি সাঙ্গ হলেই আমার জীবনের কাজ ফুরোবে। যদি অমর হই তো এই কীর্তির জন্য অমর হব।''[৯]

লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমে পড়াশোনা, সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালতে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি জ্ঞানার্জন ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র

পেয়ে যান। স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন—

> ''লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমের সভ্য হয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর— ভেবে রোমাঞ্চিত হতেন—যেখানে একদা পড়াশুনো করেছেন কার্ল মার্কস্, ভ্লাদিমির লেনিন-এর মতো মানুষেরা ! আই.সি.এস. শিক্ষানবিশ হিসেবে লণ্ডনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালতগুলিতে দিনের পর দিন মনোযোগী ছাত্রের মতো জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি। সেইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স, লণ্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, বিভিন্ন মামলার শুনানি ও রায় শুনতে যেতে হত লোয়ার কোর্ট ও হায়ার কোর্টে। ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতে হত লণ্ডন ছাড়িয়ে উলউইচ-এ। এ ছাড়াও নাটক, ব্যালে, সংগীত, পিয়ানো, বেহালা— সবরকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন নিয়মিত দর্শক ও শ্রোতা। লণ্ডনে YMCA-র সভ্য হন তিনি। দেশে ঢেঙ্কানাল, পাটনা ও পুরীতে রোজ সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল তাঁর— সেই অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন YMCA-তেও। সপ্তাহে একদিন সেখানকার সুইমিংপুলে গিয়ে সাঁতার কাটতেন। লণ্ডনের লেকেও সাঁতার কেটেছেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় ব্যসন ছিল টেনিস খেলা। এভাবে সর্বপ্রকারে নিজেকে একজন 'স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলছিলেন তিনি।''[১০]

১৯২৮ সালে লণ্ডনে জয়স নামে এক অভিজাত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় অন্নদাশঙ্করের। এই পরিচয় থেকে শেষ পর্যন্ত প্রণয়ের সম্পর্ক। জয়সের সঙ্গে তিনি ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ঘুরেছেন। দেখেছেন দেশ মানুষ ও জীবন। আর সংগ্রহ করেছেন জীবনে সাহিত্যের রসদ। একই সময়কালে তিনি বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল, রেবেকা ওয়েস্টের বক্তৃতা শোনেন। এই সময় তিনি সাহিত্যচর্চা বিশেষত বিশ্বসাহিত্যের আর্টকে রপ্ত করার প্রচেষ্টা চালান। ভবিষ্যত সাহিত্যচর্চার রূপরেখা এখানেই পেয়ে যান। বর্তমান ও ভবিষ্যতকে মিলিয়ে এখান থেকেই উপন্যাস শিল্প সৃষ্টির যাত্রা শুরু করতে চান—

> ''এখানেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, দেশে ফিরে সীমিত সময়ের জন্য আই সি এসের চাকরি করবেন; তারপর তিনি হবেন আপাদমস্তক সাহিত্যিক। বুদ্ধিদীপ্ত, মননসমৃদ্ধ আর্টের স্রষ্টা হবেন। যা হবে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের বীজ এখানেই উপ্ত হয় তাঁর মনে; প্রথমে ভেবেছিলেন এই বৃহৎ উপন্যাস তিন

খণ্ডে সমাপ্ত করবেন; পরে তা পাঁচ ও শেষে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হয়। এই উপন্যাস শেষ করতে সময় লেগেছিল বারো বছর, ১৯৩০ থেকে ১৯৪২।"[১১]

সত্যাসত্য উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র উজ্জয়িনীর কথা মাথায় আসে বিলেতে দ্বিতীয় বছর ভ্রমণকালে। জীবনে চলার পথে তিনি যেন কুড়িয়ে পেলেন উজ্জয়িনী নামটি। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—

"জার্মানির বার্লিন, ড্রেসডেন, আইসেনাখ, নিউর্নবার্গ ও ভাইমার চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ এবং ইটালির মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও রোম ছিল আমাদের ভ্রমণসূচির অঙ্গ। আমার পরিকল্পিত উপন্যাসের কথা ছিল আমার মনে। তখনই মনে হয়েছিল, ফ্লোরেন্স যদি ইউরোপীয় নারীর নাম হতে পারে তা হলে ভারতীয় নারীর নাম উজ্জয়িনী হতে পারে না কেন?"[১২]

লণ্ডনের অনেক প্রবাসী বাঙালি পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লণ্ডনের মহিলা কলেজগুলিতে বাঙালি মেয়েরাও পড়তেন। বিপিন চন্দ্র পালের ছেলে নিরঞ্জন পালের বাড়িতে অনেক প্রবাসী বাঙালির সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ ছিল। খুবই স্নেহশীলা একজন আইরিশ মহিলা ছিলেন নিরঞ্জনের স্ত্রী। তিনি সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীরের সাক্ষাৎ পান নিরঞ্জন মহাশয়ের বাড়িতে। সাজপোশাকে সাহেবিয়ানা থাকলেও বাঙালিয়ানাকে একেবারেই ভুলে যাননি। নিরঞ্জন পালের বাড়িতে প্রবাসী বাঙালিদের ভোজ অনুষ্ঠানে বাঙালি সাজে অনেক প্রবাসী বাঙালিও তাদের বাঙালিয়ানার সাথে পরিচিত হন—

"হুমায়ুন কবীরকে আমি প্রথম দেখি নিরঞ্জন পালদের বাড়িতেই। একবার তাঁরা কী একটা উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালিদের একটা ভোজ দেন। আমরা দিশি পোশাক পরে সেখানে খেতে যাই। সেই আমার লণ্ডনের রাস্তায় প্রথম ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে বেরিয়ে পড়া। ভোজের সময় আমরা সকলে মেঝেয় বসে পাতা পেতে খাই। আমার সামনের সারিতে বসেছিলেন সুবিখ্যাত মৃণালিনী সেন। তাঁর স্বামী কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন। আর তাঁর তিন কন্যা ভায়োলেট, প্যানসি ও রোজি। তাঁদের এক প্রস্ত বাঙালি নামও ছিল। যেমন ভায়োলেটের নাম শ্রীলতা।"[১৩]

এই অবাধ মেলামেশার সুযোগ তাঁর জীবনে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয় চিন্তা গড়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছিল।

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯২৯ সালে আই.সি.এস প্রশিক্ষণ পর্ব সমাপ্ত করে জন্মভূমিতে ফিরলেন। প্রথমেই গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করতে। তিনি আই.সি.এস. হয়েছেন

শুনে গুরুদেব খুশি হলেন। সেই সঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক প্রশ্ন করে ফেললেন অন্নদাশঙ্করকে।

'তুমি বেঙ্গল চেয়ে নিলে কেন? আমি হলে ইউ পি চেয়ে নিতুম।'[১৪]

অন্নদাশঙ্করের মন ছিল বাঙালি জীবনের সঙ্গে জীবন মেলানো। পঁচিশ বছর কেটেছে বঙ্গদেশের বাইরে। বঙ্গদেশ ও বাঙালি জীবনের প্রতি ছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণ। কী করে তিনি গুরুদেবকে বোঝাবেন? বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির সাথে মিশতে দরকার বাংলাদেশে পাঁচটি বিভাগে অন্তত পাঁচটি বছর বাস করা ও বাঙালি মানুষকে চেনা। উদ্দেশ্য একজন বাঙালি সাহিত্যিক হওয়া। তিনি বলেছেন—

> ''শিকড়ের সন্ধানে আমি আমার পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে এসেছি। এখন থেকে আমি প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক নই, নিছক বাঙালি সাহিত্যিক।''[১৫]

সরকারি চাকরিতে পাঁচ বছরের বেশি চাকরি না করে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে কর্মে নিযুক্ত হয়ে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, সেটি ধর্ম নিয়ে। ধর্ম সম্পর্কে উদার মানুষ অন্নদাশঙ্করকে দেখতে হল ধর্মীয় সংকীর্ণতার রূপ—

> ''চাকরিতে নিয়োগের সময় আমাকে হিন্দু বলে চিহ্নিত করা হয়নি। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত সিভিল লিস্টেও আমি হিন্দু বলে গণ্য হইনি। কিন্তু আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলুম যে ভেতরে ভেতরে একটা হিসাবনিকাশ চলেছে। আর সেটা ধর্ম অনুসারে। সত্যিকার সেকুলারিজম হল ধর্মনির্বিশেষ বা ধর্মনিরপেক্ষ। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সত্যিকার সেকুলারই ছিল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ যেদিন আমি হিন্দু বলে চিহ্নিত হই সেদিন পর্যন্ত।''[১৬]

জীবনাভিজ্ঞতার একটি পর্বে প্রত্যক্ষ প্রবেশ ঘটল যেন তাঁর। দেখলেন বাংলাদেশ তখন এক রণক্ষেত্রে পরিণত। দুই দিক থেকে বাংলাদেশ রণক্ষেত্র সিক্ত হয়ে চলেছে। একদিকে হিন্দু-মুসলমান লড়াই অন্যদিকে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালি। দুই লড়াইয়ের পদ্ধতি ও পরিণতি পৃথক। হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ের পদ্ধতি হল দাঙ্গা হাঙ্গামা আর ইংরেজ বাঙালির লড়াইয়ের পদ্ধতি হল ইংরেজের প্রাণহানি ও বাঙালির ফাঁসি বা দ্বীপান্তর। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি বুঝতে পারলেন হিন্দুরা ধর্মে উদার কিন্তু সমাজে উদার নয়। আর মুসলমানেরা সমাজে উদার কিন্তু ধর্মে অনুদার। ভাবলেন হিন্দুকে সমাজে উদার হতে হবে আর মুসলমানকে হতে হবে ধর্মে উদার। আর তা না হলে ব্রিটিশ শাসক থাকুক আর নাই থাকুক হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ চলতেই থাকবে। অন্যদিকে

লবণ সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরের পরিস্থিতি প্রশাসকের আয়ত্তের বাইরে। প্রশাসক হিসেবে অন্নদাশঙ্কর পরিবেশটাকে আন্দাজ করতে পারলেন। লবণ সত্যাগ্রহ দমননীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে পরিণতি স্বরূপ পেডি নামে একজন ইংরেজ যিনি মেদিনীপুরের জেলা শাসক ছিলেন তিনি খুন হয়েছেন। সেখানে পরপর আরও দু'জন জেলা শাসক নিহত হন। এই সব আন্দোলনের তরঙ্গ বিক্ষোভের ছাপ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই ২২ বছর কর্মজীবনে ২১ বার বদলি হয়েছেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায়। বদলির সূত্রে তাঁর সমগ্র বাংলা দেখবার ও জানবার সুযোগ হয়েছিল।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক জীবনে তাঁর স্ত্রী লীলা রায়ের অবদান অসামান্য। প্রকৃত নাম অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডোর্ফ। ১৯২৯-এ দেশে ফিরে পঁচিশ বছর বয়সে সরকারি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হলেন। প্রথমেই হলেন বহরমপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এই সময় তাঁর জীবনে একটি মহত্তম অধ্যায় রচিত হওয়ার সূত্রপাত হল। ১৯ বছর বয়সি মার্কিন তরুণী অ্যালিস ভার্জিনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ। বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে ইতিপূর্বে একবার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমে আলাপ হয়েছিল। অ্যালিস ভার্জিনিয়া ছিলেন সংগীতজ্ঞা, পিয়ানোবাদিকা। তিনি ভারতীয় সংগীত শিখতে চান। ভারতীয় কাব্যসাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণ ছিল। মার্কিন তরুণী একদিন ভারতে এসে পৌঁছালেন। ভারতীয় সংগীতের ছাত্রী হয়ে। পরিচয় ঘটল অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠল প্রেমের সম্পর্ক। মাস কয়েকের মধ্যে প্রেম পরিণত রূপ নিল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। দিনটি ১৯৩০ সালের ২৩শে অক্টোবর। অন্নদাশঙ্করের জীবনে তাঁর বিবাহ ও পরবর্তী জীবন কঠিন চ্যালেঞ্জের এবং তা সফলও। যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আধুনিক মননশীলতা ও যুক্তিবাদী মনোভাব নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তা তিনি জীবনেও শুরু করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত জীবন থেকেও উঠে আসা। অ্যালিসের বাবা-মা এই বিবাহে সম্মতি দেননি। অ্যালিস প্রয়োজনে মার্কিন তরুণীর পরিচয় থেকে নিজেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়েছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় নারী, বাঙালি বধূ। বিচ্ছেদ ঘটল মার্কিন মুলুক থেকে। ভারতের তথা বাঙালি জীবনের ভিত্তিভূমিতে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। বিবাহের পর তাঁর বাঙালি নামকরণ হল লীলা রায়। অন্নদাশঙ্কর রায় লীলাময় ছদ্মনামে কোনো কোনো লেখা লিখতেন। সেই সূত্রে পত্নীর নাম হল লীলা। অন্নদাশঙ্করের বাবাও প্রথমে তাঁদের বিবাহে সম্মতি দেননি। কিন্তু লীলা নামটি শুনে, লীলা মানুষটিকে দেখে, পুত্রবধূর মুখে বাংলা ভাষায় বাবা সম্বোধন শুনে, কপালে সিঁদুর, পরণে শাড়ি দেখে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হলেন এবং লীলাকে আপনার মেয়ে বলে সাদরে গ্রহণ করলেন।

তাঁদের সুদীর্ঘ সুখী ও শান্তিময় জীবনে স্ত্রী লীলা রায় অন্নদাশঙ্কর রায়কে সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় হয়ে ওঠার পেছনে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন। ইউরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য লীলা রায়ের কাছে জেনে তাঁর উপন্যাস শিল্প আরও সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর প্রেমের শক্তি আন্তরিকতার শক্তি তথা নারী শক্তির অফুরন্ত মহিমা যেন অন্নদাশঙ্করের জীবনের একটি বড় অংশ। অনেক মানুষই থাকেন যারা গড্ডলিকায় গা না ভাসিয়ে নিজের হাতে জীবন নির্মাণ করেন। জীবন নির্মাণে প্রশ্নের মুখোমুখী হয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন ও ফলপ্রসূ করেন। সেরকম একজন ব্যক্তিত্ব অন্নদাশঙ্কর রায়। আর অবশ্যই এরকম একটি সিদ্ধান্ত শ্রীমতি লীলা রায়কে জীবনসঙ্গিনী করা। ২২ বছরের কর্মজীবনে তাঁকে পারিবারিকভাবে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সে সব অনায়াসেই সামলেছেন লীলা রায়। তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী। তাঁদের পুত্র আনন্দরূপ রায়ের কথায় তারই ইঙ্গিত মেলে—

> ‘‘বাবা এবং মা যুক্তভাবে যে জীবন আরম্ভ করেছিলেন সেটা ছিল একেবারেই তাঁদের নিজস্ব। পরীক্ষামূলক এবং পথিকৃতের জীবন। বাবার চাকরি জীবনের বাইরে বাবা-মায়ের নিজস্ব জীবন ছিল অনেক বিশাল আর বিস্তৃত। ছ-খণ্ডে ‘সত্যাসত্য’ উপন্যাস বাবা বিয়ের আগেই লেখা শুরু করেছিলেন। বাবা যে— সত্য নিজে নিজে উপলব্ধি করেছিলেন, যে সত্যকে অবলম্বন করেছিলেন তার সঙ্গে কেমন করে যেন হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসা মায়ের সত্যের মিল হল। এটাই তাঁদের জীবন সাধনার মূল কথা। তাঁদের প্রথম দিকের এবং শেষের দিকের পরস্পরকে লেখা চিঠিপত্র পড়লে এবং তাদের একসঙ্গে দুজনের ফোটো দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁদের মধুর সম্পর্ক সারা জীবন কেমন গভীর ও অটুট ছিল। এটা পরিষ্কার যে তাঁরা পরস্পরের সাহচর্যে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিলেন।’’[১৭]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কালে ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে একদিকে আলোচনা হচ্ছে ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে অন্যদিকে জহরলাল নেহেরু ইনডিপেনডেন্সের দাবি তুলেছেন। অন্নদাশঙ্কর ছিলেন গান্ধীভক্ত। আবার তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে গান্ধীভক্ত প্রশাসকের কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা দক্ষ প্রশাসকের অন্দরে আছে সাহিত্যিক মন। তিনি হৃদয়গ্রাহী। এ প্রসঙ্গে তার জীবনে এক চমৎকার আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। বহরমপুরে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন একবার দাঙ্গা বাধার মতো কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে যেতে হয়েছিল। সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়ত আলি সাহেব

পাঠিয়েছিলেন দাঙ্গা সামলাতে—

> ''একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'মামলা মোকদ্দমা বিচার করা ছাড়া আপনার আরও গুরুতর কাজ হবে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হলে ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া। আমাকে একবার যেতে হয়েছিল। সঙ্গে চারটি বন্ধুকধারী সেপাই। গিয়ে দেখি এক বিরাট জনতা চিৎকার করছে, তাদের দাবি মানতে হবে। আমি বলি, হ্যাঁ, তোমাদের দাবি বিবেচনা করে দেখব, কিন্তু আগে তো চলে যাও দেখি। তারা আমার হুকুম অমান্য করে। তখন আমার কর্তব্য হচ্ছে লাঠি চার্জ করা। তাতেও যদি ছত্রভঙ্গ না হয়, গুলি চালানো। লাঠি নিয়ে যাইনি। কিন্তু গুলি চালানোর হুকুম দিতে আমার সাহস হয় না। তাতে হয়তো চারটে মানুষ মরবে, কিন্তু আমারও চারটে সেপাই প্রাণে বাঁচবে না। তখন আমি একটা টেবলের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে দিলুম। এটা ওরা প্রত্যাশা করেনি। হতভম্ব হয়ে হেসে উঠল। গোলমালটা আপনিই মিটে গেল।''[১৮]

মানসিকভাবে সত্যাগ্রহী অন্নদাশঙ্কর পূর্বেই স্থির করেছিলেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনও অন্যায় আদেশ পালন করবেন না। সেরকম অবস্থার সম্মুখীন হলে আপোস করবেন না। চাকরি জীবনে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যিক জীবন গড়ে তুলবেন। বহরমপুর থেকে বাঁকুড়ায় বদলি হওয়ার পর প্রশাসকের সাথে সাথে সংসার জীবনেরও সূত্রপাত হল। দেশে তখন ভারত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়ে চলেছে। অহিংস ও সহিংস উপায়ে ভারতমাতার বন্ধন মুক্তির আন্দোলন। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসক ও মনে মনে ভারতমাতার মুক্তি সংগ্রামের একজন রাজনৈতিক কর্মীও। অন্যদিকে কালজয়ী উপন্যাস রচনার কাজ। দ্বন্দ্ব কাজ করে চলে মনোজগতে। দ্বন্দ্বের সঙ্গে তাল রেখে উপন্যাসও বিকশিত হয়। দেশের মানুষের কাছেও ছিল তাঁর দেশপ্রেমের পরীক্ষা। নওগাঁর একটি প্রতিষ্ঠিত সংকটত্রাণ আশ্রমে গিয়ে সমস্যায় পড়েন—

> ''একবার খুব মুশকিলে পড়ি। আশ্রমিকরা ছাব্বিশে জানুয়ারি কংগ্রেসের নির্দেশমতো ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। জন বুলের কাছে সেটা একটা রেড র‍্যাগ। জেলাশাসক পিনেল সাহেব আমাকে বলেন আশ্রমিকদের জানাতে যে ওই ত্রিবর্ণ পতাকা যদি তাঁরা নামিয়ে না নেন তা হলে আশ্রমটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হবে। আমি আশ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে বলি, 'আপনারা সেবাকর্মী, কিন্তু ওই ত্রিবর্ণ পতাকা রাজনীতি সূচক। সরকার এটা সহ্য করবে না। আপনারা এটা

নামিয়ে নিন।' ওঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'নামিয়ে যদি নিতেই হয়, আপনিই নামিয়ে নিন। আমরা পারব না।' অগত্যা আমাকেই নামিয়ে নিতে হল। কিন্তু সেই পতাকা আমি সরকারে জমা দিলুম না। সেই পতাকা চলল আমার সঙ্গে বাক্সবন্দি হয়ে নানান মহকুমায় নানান জেলায়, যত দিন আমি চাকরিতে ছিলুম। দেশ যেদিন সত্যিসত্যিই স্বাধীন হল, সেদিন হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকরা আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন হাওড়া সার্কিট হাউস থেকে হাওড়া ময়দানে। তাঁদের উপরোধে পড়ে আমাকেই স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করতে হল মহাসমারোহে। জেলা জর্জ হিসাবে নয়, দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক হিসাবে।"[১৯]

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবন বিচিত্র, বিস্তৃত ও বহুমুখী। দেশের মধ্যে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। তাঁর অন্তর্জগতে চলছে ঘটনার আনুপূর্বিক বুদ্ধি ও বিবেকজাত বিশ্লেষণ ন্যায়-অন্যায় বিচার। বহির্জগতে চলছে নিয়ম ও নীতিনিষ্ঠ প্রশাসনিক কাজ। অন্দরে মধুর দাম্পত্য, বিনোদনে খেলাধূলা এবং সুগভীর মননঋদ্ধ সাহিত্যচর্চা।

১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার একটি অন্যতম পর্ব। তাঁর অনেক প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, ছড়ায় এখানকার অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যাবে। এখানে হিন্দু ও মুসলমান জমিদার এবং ইংরেজ প্রশাসকদের দেখেছেন খুব কাছে থেকে। দেখেছেন তাঁদের নানাবিধ দোষগুণ। কর্মক্ষেত্রে অনেক ভালো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলেও শত্রুও কম হয়নি। একজন দক্ষ ম্যাজিস্ট্রেট মি. পিনেলের কাছে শিখেছেন অনেক কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক টুকিটাকি। হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্য সৃষ্টি যে ইংরেজদের মদতে হয়েছিল তা বুঝলেন মি. পিনেলের আচরণে। একটি ঘটনার উল্লেখই তা যথেষ্ট—

''দেখি এক প্রৌঢ় হিন্দু ভদ্রলোক তক্তপোশের উপর বসে কথা বলছেন মেজের উপর বসে থাকা এক মুসলমান চাষির সঙ্গে। তাকে সম্বোধন করছেন 'ভাই' বলে, সে কিন্তু কথা বলছে হাত জোড় করে। কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা দণ্ডনীয়। আমি কিন্তু চটে গেলুম হিন্দু মুসলমানের এই বৈষম্য দেখে। এটা শ্রেণীবৈষম্যও বটে। মুখে 'ভাই' বললে কী হবে বস্তুত বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্যর অপর নাম। কাজেই সেই হিন্দু ভদ্রলোককে শিক্ষা দিতে চাইলুম। জেলে মাটিতে বসে ভাত খেতে হবে চাষি মুসলমানের সঙ্গে, একসারিতে। তাতে সাম্প্রদায়িক সাম্য তথা শ্রেণীসাম্য জোরদার

হবে। সুতরাং আমার সঙ্গের কনস্টেবলদের হুকুম দিলুম ওই দুই আদমিকে পাকড়াও করে রাজশাহি সদরে চালান দিতে। কিন্তু ফল হল ঠিক বিপরীত। পিনেল সাহেব মুসলমানটিকে বললেন, 'মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজের কোনও ঝগড়া নেই। তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি বাড়ি চলে যাও।' দিন সাতেক বাদে তিনি হিন্দুটিকেও ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সর্তক করে দিয়ে। আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম মুসলমানদেরকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখাই ব্রিটিশ পলিসি। আর মুসলমানরাও সরে থেকে ইংরেজদের প্রীতিভাজন হয়।"[২০]

আবার আইনঅমান্য আন্দোলনের (১৯৩২) শরিক কত না জনদরদী সত্যিকার ভালো মানুষকেও নিরুপায় সাজা দিতে হয়েছে অন্নদাশঙ্করকে। এ প্রসঙ্গে যশোদারঞ্জন চক্রবর্তীর কথা বলতেই হয়। দেশসেবার জন্য প্রশাসক অন্নদাশঙ্করের নির্দেশে তার কারাবরণ। বিচারককে দুঃখ পেতে হলেও যশোদারঞ্জন গর্বিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে লেখকের প্রিয়বন্ধুও হন। তিনি যখন রাজসাহীর নওগাঁতে মহকুমা শাসক (১৯৩১-৩৩) তখনই জন্ম হয় তাঁর প্রথম সন্তান পুণ্যশ্লোকের। ১৯৩৩ সালেই তাঁকে জুডিসিয়াল ট্রেনিং-এর জন্য চট্টগ্রামে যেতে হয়। এখানে কয়েকমাস থেকে আবার ঢাকায়। চট্টগ্রামে শুরু করা *সত্যাসত্য*-এর *অজ্ঞাতবাস* ঢাকায় শেষ হল এবং সেই সঙ্গে *পুতুল নিয়ে খেলা*-ও শেষ করলেন। জুডিসিয়াল ট্রেনিং-এর সময় কাজ কম ছিল বলে লেখালেখিতে বেশি মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন। এখান থেকে তাঁর জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পোশাক আশাক চালচলন বদলে যায়। পুরোপুরি সাহেবিয়ানা থেকে স্বদেশীয়ানায় পরিণত হন। মনে প্রাণে গান্ধীবাদী। সাহেবদের আধিপত্যে মোড়ানো ঢাকা ক্লাবে অন্য কোনো ভারতীয় নেবে না জেনে তাঁর এই প্রতিবাদী পরিবর্তন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বোতভাবে সমর্থন ও উৎসাহ পেয়েছেন স্ত্রী লীলারায়ের কাছ থেকে। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের আবেদন অনুসারে *বারোজনা* নামে একটি মণ্ডলী গঠন করেন। অন্নদাশঙ্কর রায়কেই নামকরণটি দিতে হয়েছিল। বারো মাসে বারো জনের একটা বারোয়ারি বৈঠক এই মন্ত্রীমণ্ডলীতে হত। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। সেই বারোজনার মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। এছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী আই.সি.এস আর্থার হিউজ এবং অন্নদাশঙ্কর রায় স্বয়ং। সাহিত্যচর্চার জগতে তৃপ্তি মেটার জায়গা পেলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত *সবুজবাংলা* পত্রিকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বুলবুল* পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকলেন।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে নানা স্পষ্ট কথা। অনেকের কাছেই তা ছিল বিতর্কমূলক। কিন্তু তিনি পিছু হটেননি। এই লেখালেখির সূত্রে অনেক সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল—

> ''লেখালেখির সূত্রে আজিজুল হাকিম, হাবিবুল্লাহ বাহার, শামসুন নাহার, সুফিয়া এন হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাত অথবা পত্রে যোগাযোগ হয়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, শহীদুল্লাহ প্রমুখের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ডাক পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য।''[২১]

বিশেষ করে অন্নদাশঙ্কর দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলেছেন যাঁদের সঙ্গে তাঁর চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব হয়েছিল—

> ''ঢাকায় আমি কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন এই দুই অধ্যাপককে একই সঙ্গে দেখি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এঁদের সঙ্গে পরিচয় চিরস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এঁরা দুজনেই ছিলেন 'শিখা' গোষ্ঠীর সদস্য ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নায়ক। বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিক হিসাবে এঁদের দুজনের স্থান অতি উচ্চে।''[২২]

এঁদের সংস্পর্শে তাঁর সাহিত্যচর্চা আরও মননশীল হওয়ার ভিত্তি প্রস্তুত করে। ১৯৩৪ সালে ঢাকা থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমায় বদলি হলে *বারোজনা*-র সাথে আর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা সম্ভব হয় না।

বিষ্ণুপুরে জন্ম হল দ্বিতীয় পুত্র চিত্রকামের। *সত্যাসত্য*-এর *কলঙ্কবতী*ও লেখা হল বিষ্ণুপুরে। তাঁর ভ্রমণবিলাসী মন উৎসুক হয়ে উঠেছিল। প্রশাসক হিসেবে নয়, ব্যক্তি অন্নদাশঙ্কর সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর হিসেবে। ছুটি নিয়ে সপরিবারে যান দেরাদুন। সেখান থেকে ভ্রমণে যান হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন। তিনি ধার্মিক না হলেও শখ করে কেনেন নামাবলি। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য তীর্থযাত্রা নয়, ভারতবর্ষের চরিত্র অনুসন্ধান। ভ্রমণ সমাপ্ত করে এসে ১৯৩৫ সালে আবার বদলি হন কুষ্ঠিয়ায় মহকুমা হাকিমের মর্যাদায়। কুষ্ঠিয়া শহরটি তাঁর হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে গেছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ আর লালন ফকিরের ছেঁউরিয়া। সেখানকার কুমারখালিতে বাস করতেন *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*-র সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার যিনি ফিকিরচাঁদ বাউল নামে লিখতেন। এই অঞ্চলের মানুষ ছিলেন *বিষাদ সিন্ধুর*-র লেখক

মীরমোশারফ হোসেন। অন্নদাশঙ্কর রায় এ এলাকার সাথে পরিচয়ের স্বাদ গ্রহণ করলেন। কুষ্ঠিয়ায় এককালে নীলকর সাহেবরা ছিলেন। একটা দর্শনীয় বিষয় ছিল গোরাই নদীর ব্রিজ যা সৌন্দর্য পিপাসু লেখক মনকে মোহিত করেছিল। এছাড়া দেখেছেন একটি গ্রামে দুটি মসজিদ। শুধু হিন্দু আর মুসলমানে জাতিভেদ নয়, মুসলমানের মধ্যেও জাতিভেদ। একটি মসজিদ চাষিদের জন্য আর একটি মসজিদ জোলাদের জন্য! সমাজ, ধর্ম, জাতিবিরোধ, মানবিকতার অপমান এ সব বিষয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল লেখকের। প্রতিবেশী ফজলুল বারি চৌধুরীর কাছে একদিন জানতে পারলেন মুসলমানেরা জানে না কোনটা তাদের দেশ। অন্নদাশঙ্করের উপলব্ধি—

> ''হিন্দুদের দেশ যেমন হিন্দুস্থান, বাঙালিদের দেশ যেমন বাংলা দেশ, মুসলমানদের দেশ তেমন কী? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেল পাঁচ বছর বাদে মুসলিম লীগের নেতাদের মুখে। সাতশো বছর ধরে হিন্দুস্থানে বাস করার পরে তাঁরা কলম্বসের মতো আবিষ্কার করেন যে তাঁদের দেশ পাকিস্তান। বাংলাদেশও যার সামিল।''[২৩]

ক্রান্তদর্শী উপন্যাসে এই উপলব্ধির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে কংগ্রেসের আইনঅমান্য আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সন্ত্রাস হামলা স্তিমিত হতে চলেছিল। মাঝখান থেকে মাথাচাড়া দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ। প্রশাসক অন্নদাশঙ্করের কাছে সার্কুলার এসেছিল কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সংগঠনের নাম। হঠাৎ পিতার দেহান্তর হওয়ায় শোকাহত হলেন তিনি। তবুও বনস্পতির মতো থেকে কঠিন পরিস্থিতি সামলেছেন। সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতা, লিখেছেন প্রবন্ধ উপন্যাস। কুষ্ঠিয়ায় থাকতেই *সত্যাসত্য*-এর চতুর্থ খণ্ড *দুঃখমোচন* লেখা হয়। ১৯৩৭ সালে রাজশাহী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গ্রাম ও শহর ঘুরে ঘুরে প্রশাসনিক কাজ করেছেন। এখানে জন্ম হল তাঁর তৃতীয় সন্তান তথা প্রথম কন্যা জয়ার। মনে এক সুখের স্মৃতি নিয়ে এল।

হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা তাঁকে ব্যাথিত করেছে। তিনি দেখেছেন নতুন প্রজন্মের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় ঔদার্য ক্রমে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের মধ্যেও এসেছে পক্ষপাত। তিনি কিন্তু দাঙ্গার সময় কড়া প্রশাসক। ধর্মনিরপেক্ষ রাজপুরুষ বা জনসেবক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁর কর্তব্য। সেটাই সরকারি নীতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নীতি পক্ষপাত অবলম্বন করে। দাঙ্গার পরোক্ষ কারণে আবার তাঁকে বদলি হতে হল চট্টগ্রামে। এখানে এসে দেখলেন স্পষ্টতই সরকারের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি ও ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের নজির। শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল হক মুসলিম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক পক্ষপাতপূর্ণ টেলিগ্রাম পাঠান ও তা অন্নদাশঙ্করের নজরেও আসে। চট্টগ্রামেই আলাপ ও বন্ধুত্ব হয় আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবুল ফজল,

এনামূল হকের সঙ্গে। যাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে। অন্যদিকে পরিচয় হয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জিন্না সাহেব ও ব্যারিস্টার আজম সাহেবের সঙ্গে। মুসলিম লীগের উত্থান লক্ষ করেন তখন থেকেই। তাঁর কাজ জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র দিক নিরীক্ষণ করা। আই.সি.এস-এর মতো জীবিকা তাঁকে এতবড় সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু তিনি তাতে অতৃপ্ত ছিলেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, গোলটেবিল বৈঠক, দ্বিজাতিতত্ত্বের বিদ্বেষ, ইংরেজ শাসকের কূটনীতি, জিন্নার ভূমিকা, গান্ধীজীর ভূমিকা, দেশভাগের কারণ প্রভৃতি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গভীর ও নির্মোহ যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখেছেন। ইংরেজের ভেদনীতি কিংবা কংগ্রেসের অভেদনীতি, জিন্নার মুসলমানদের জন্য বেশি দাবি সবই দেশভাগের কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন।

চট্টগ্রামের পালা শেষ করে ছুটি নিয়ে ভ্রমণযাত্রায় বের হন। ফেরার পথে ঢেঙ্কানালে পৌঁছালে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দ্বিতীয় পুত্র চিত্রকামের হঠাৎ মৃত্যু। শোকে নিমজ্জিত হন রায় দম্পতি। জীবনদর্শনে এক অনন্য উপলব্ধির সঞ্চার হয়। কুমিল্লায় থাকাকালীন (১৯৩৯-৪০) সদ্য পুত্রহারা শোকার্ত অন্নদাশঙ্কর শোক ভুলতে শাশ্বতের চিন্তা করেন। উপনিষদ, গীতা, রামকৃষ্ণকথামৃত, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ পড়েন। উপন্যাসেও রয়েছে তাঁর শাশ্বত চিন্তার প্রতিফলন। নিরামিষ আহার করে জীবনটাকে সরল সাদাসিধে গান্ধীজির মতো করতে চান। জীবন যেন একটা নতুন দর্শন খুঁজে পায়। সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস রচনায় তার প্রভাব পরে। এই সময় থেকে সৌজন্যমূলক নূন্যতম সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকেন। অন্তর্জীবনে এক বৈপ্লবিক তোলপাড় নিয়ে পুত্রহারা শোকার্ত পিতা পথ খোঁজেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ, গান্ধীজীর সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য, টলস্টয় তাঁর অন্যতম গুরু। তাঁকে দিনরাত ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে কোথায় পথ, কীভাবে চলবেন এই সব প্রশ্ন। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিতে চরম বিশৃঙ্খলা। দেশজুড়ে চরম অস্থিরতা। কংগ্রেস তখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে। গান্ধিপন্থী ও সুভাষপন্থী দুটো দল। অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লীগ শক্তিশালী হয়। কৃষকপ্রজা দলের সমর্থকেরা মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে। পাকিস্তান গঠনের দাবি ও দাবির বিরোধীতায় রাজনৈতিক মহল দ্বিধাবিভক্ত। হিন্দু-মুসলমান শিখ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে অবিচল। অন্নদাশঙ্করও দেশ ও শোকার্ত হৃদয় দুই-এর মাঝখানে আন্দোলিত। অন্যদিকে জীবন জিজ্ঞাসা খুঁজতে উপন্যাস রচনার আকর্ষণ। এই সময় তিনি *সত্যাসত্য*-এর পঞ্চম খণ্ড *মর্তের স্বর্গ* (১৯৪০) রচনায় হাত দেন। জীবনকে একেবারে নিরহংকারী, বিনম্র ও সত্যাগ্রহী করে তুলেছেন। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে জন্ম নিল তৃতীয় পুত্র আনন্দরূপ। চাকরি ছেড়ে সান্ত্বনা খুঁজতে চান। গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুত্র শোকের সান্ত্বনা প্রার্থনা করেন।

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেন। গান্ধীজি সব শুনে নীরব থাকেন। মহাত্মার চোখ সজল হয়ে ওঠে। তিনি সান্ত্বনা দেন যে মৃত্যুকে কেউ ঠেকাতে পারে না। অন্নদাশঙ্করের মনে এক জীবনজিজ্ঞাসার উদয় হয়—

> ''আমি ভাবি তবে কি মৃত্যু বলে কিছু নেই? আমরা অযথা ভয় পাই? আমার প্রতীতি জন্মায় যে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। মানবজীবনের শেষ বলতে পারো। কিন্তু মানবজীবনই কি শেষ? পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।''[২৪]

চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ভাবনা নিয়ে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে চলে এলেন শান্তিনিকেতন—

> ''আমি মনস্থির করে ফেলি যে চাকরি ছেড়ে দেব। শান্তিনিকেতনে বসে পুণ্যকে পাঠভবনে দেব। নিজে লেখালেখি নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাব। আসবাবপত্র জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে ছুটি নিয়ে ফের বেরিয়ে পড়লুম।''[২৫]

কিন্তু চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া হল না। নির্দেশ এল মেদিনীপুর জেলা জর্জ হওয়ার। আর্থিক প্রয়োজনও ছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বেতন কম বলে সাংসারিক প্রয়োজনে বিশ্বকবির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না। এদিকে সাহিত্যচর্চার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। মনে বিষণ্ণতার ছায়া। মাত্র দশ-এগারো বছর চাকরি হয়েছে। অবসর গ্রহণ করলে পেনসনও পাবেন না। চাকরিতে বহাল থাকতেই হয়। মেদিনীপুর থেকে আবার বাঁকুড়া জেলা জর্জ হয়ে এলেন। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়ায় থাকলেন। পর্যাপ্ত সময় পেয়ে *সত্যাসত্য*-এর শেষ পর্ব *অপসরণ* এখানেই লেখা হয়। *সত্যাসত্য* কালজয়ী উপন্যাসের ষষ্ঠ ও শেষ খণ্ড। এটি তাঁর গভীর ও দীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—

> ''বাঁকুড়ায় বসে আমি 'অপসরণ' লিখি। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের ষষ্ঠ ও শেষ খণ্ড। বারো বছরের তপস্যায় সেইখানেই ইতি। জীবনে যত কাজ হল না সারা এই কাজটিও তার মধ্যে পড়ত যদি জীবনটাই পঁয়ত্রিশ বছরে সারা হত। জীবনদেবতা আমাকে তিন বছর গ্রেস দিয়েছিলেন। 'অপসরণে'ও আগাম সংকটের ছায়া পড়েছে। যদিও 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের বৃত্তান্ত ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালের। সে সময় আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলুম। সেটা একটা যুগসন্ধি। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মাঝামাঝি এক গোধূলিকাল। আমি ভাগ্যবান যে সে সময় ইউরোপে ছিলুম। বিদগ্ধ বাঙালি পাঠকের জন্য এটা ছিল আমার কৃত্য। ব্রতও বলা যেতে পারে। তখন মনে করতুম এটাই আমার জীবনের কাজ। লাইফ ওয়ার্ক।''[২৬]

অখণ্ড ভারতীয় জাতীয় জীবনের ভবিষ্যত তাঁকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল। গান্ধীজি ও কংগ্রেসের পারস্পরিক অবস্থানের মধ্যে যে নৈতিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব, অহিংসা ও শান্তির পক্ষে গান্ধীজি একেবারে একা ও নিঃসঙ্গ— এই মর্মান্তিক উপলব্ধি লেখকের চিন্তাকে অধিকার করে রাখত। দেশবাসীর মধ্যে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। জাপানি আক্রমণ ঘটলে ইংরেজ সরকারের নীতি কী হবে সেই নির্দেশ চলে এসেছিল অন্নদাশঙ্করের মতো অফিসারদের কাছে। অফিসাররাও তৈরি ছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন বিপদ্‌জনক। ইংরেজ সরকারও যেন বিপাকে পরে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে পারছেন না। কলকাতায় ব্লাক আউট। বোমার ভয়।

বহুলোক মফস্‌সলে নিরাপত্তার জন্য সমাগত। যুদ্ধকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো আশা নেই দেখে কংগ্রেস-গান্ধী নেতৃত্ব আবার সংগ্রামে নামে। এর নাম ভারতছাড়ো আন্দোলন। সরকার গান্ধীজিকে জেলে বন্দী করে রাখেন। হিংসা-প্রতিহিংসা চরমে ওঠে। এই আন্দোলন নাকি হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই মুসলিম লীগ এতে অংশ নেয়নি। গান্ধীজি যখন বলেন কুইট ইণ্ডিয়া, জিন্নাসাহেব জুড়ে দেন ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। ভাগ করো আর ত্যাগ করো। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসির পরিণাম। অন্নদাশঙ্কর রায় মনে মনে গান্ধীজির পক্ষে। তাঁর কাছে ভারত বলতে গান্ধীজির আদর্শ ও নৈতিক নেতৃত্ব। সারা বিশ্বের চোখে মহাত্মা অহিংসার প্রতিমূর্তি। কিন্তু ভারতছাড়ো আন্দোলনে ইংরেজরা প্রচার করছে গান্ধীজি হিংসার সমর্থক। গান্ধীজি একুশ দিন অনশন করে ব্রতের সংকল্পে দৃঢ় থাকলেন। ইতিমধ্যে লীলা রায় অসুস্থদের, প্রসূতিদের সেবা করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায় গান্ধীজিকে নৈতিক শক্তি জোগাতে কাউকে না জানিয়ে তিনদিন অনশন করেন। আদালতে না বসার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আসল কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। কৈফিয়ৎ দেন যে এক প্রিয়জনের জন্য অনশন করেছিলেন। প্রিয়জনের নাম জানানো বিপদজনক ছিল। গান্ধীজি একুশদিনের অনশনে সে যাত্রায় বেঁচে যান। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে আভাস পেয়ে গান্ধীজি জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভাইয়ে ভাইয়ে ঘরোয়া মীমাংসা করতে চান। মতের মিল হল না। দুই ভাই নয় দুই জাতি। বন্ধু ও পরিচিতদের মুখে দু'রকম কথা শোনেন। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *বিনুর বই*-এ অন্নদাশঙ্কর লেখেন—

> ''একজন বলেন, ''পাকিস্থান না গোরস্থান ! মুসলমানের তাতে চূড়ান্ত ক্ষতি হবে।'' আরেকজন বলেন, ''ব্রিটিশরাজের পর কংগ্রেসরাজ মানে হিন্দু রাজ। মুসলমান কখনো হিন্দু রাজত্বে বাস করতে রাজি হবে না।'' অন্যরা বলেন, ''কংগ্রেস ও

মুসলিম লীগ মিলে-মিশে রাজত্ব করলে তো ল্যাটা চুকে যায়। ফিফটি ফিফটি।"[২৭]

অন্নদাশঙ্কর রায় নদীয়া জেলা জর্জ হয়ে বদলি হলেন। দেশে তখন ঊনপঞ্চাশের (১৩৪৯) মন্বন্তর। ব্রিটিশ সরকার নাজেহাল। রেশন প্রথা চালু নেই। যে যত খুশি চাল মজুত করে রাখছে। না খেতে পাওয়া মানুষ ছুটছে শহরের পথে। ভয়াবহ অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষের কবলে সমগ্র বাংলা। চারিদিকে অনাহার আর মৃত্যুর বীভৎস চিত্র। হঠাৎ দেখা পূর্বপরিচিত আখতার হামিদ খানের সঙ্গে। আখতার সাহেব সরকারি অসহযোগিতায় প্রশাসক হিসেবে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেননি বলে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করকেও বললেন ইস্তফা দিতে—

> ''যে দেশে মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, যে দেশের সরকার মজুতদার আর মুনাফাখোরদের স্বার্থে মানুষকে মরতে দিচ্ছে সে দেশে সবাই এই মহাপাপের ভাগী।' আরও বললেন তিনি যদি এখনও সরকারি চাকরি করেন, তবে শ্রীরায় জজ হলেও তাঁর 'বিবেক নির্মল নয়।"[২৮]

অন্নদাশঙ্করও বিবেকের দংশনে ভুগছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ইস্তফা দিতে পারছিলেন না। এরকম পরিস্থিতিতে উপন্যাস রচনার কাজ সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছিল। একজন ইংরেজ অতিথি তাঁকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্করের কথায়—

> ''একদিন আমাদের হোটেলে একজন ইংরেজ অতিথি আসেন। তিনি একজন পর্বতারোহী। তিনি ছিলেন দেরাদুনের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের মাস্টার। ছুটির সময় হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণ করতেন। তিনি একদিন আমাদের একটা মোক্ষম কথা বলেন যেটা শুধু পর্বতারোহণ সম্পর্কে নয়, উপন্যাস রচনা সম্বন্ধেও সত্য। আরোহণকারী যখন বুঝতে পারবে যে আর এক পা এগোলেই খাদে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু তখন সে পিছু হটবে। সেক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণই প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। The most important thing for a mountaineer to know is when he is defeated. He must accept that defeat, for not to do so is certain death."[২৯]

তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকেও পর্বতারোহীর মতো হতে হবে। চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে।

সিঁউড়ির পাবলিক লাইব্রেরিতে গ্যেটের আত্মজীবনী, টলস্টয়ের পত্নীর ডায়রি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ বই ছিল। সেগুলির নিয়মিত পাঠক ছিলেন। সেখানকার বাউল ও তাদের সাধনসঙ্গিনীদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গবেষকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাদের

আত্মদর্শন। সিঁউড়িতেই জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা তৃপ্তি। সময়টা ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাস। আবার বদলির হুকুম এল যেতে হবে ময়মনসিংহ। কিছুটা সময় নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজি তখন শান্তিনিকেতনে। মহাত্মার প্রার্থনা সভায় যোগ দিলেন। ময়মনসিংহ গিয়ে তাঁর মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। কলকাতা থেকে এত দূরে যে সাহিত্য জগতের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। এটা সাহিত্যচর্চায় একপ্রকার ঘাটতি। তিনি লিখেছেন—

> ''ময়মনসিংহ কলকাতা থেকে এত দূরে যে আমি আমার কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হতে পারব না। তাঁরাও ময়নমনসিংহে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন না। সাহিত্যিকের পক্ষে এটা একপ্রকার নির্বাসন। এটা তিন বছর স্থায়ী হতেও পারে।''[৩০]

অন্নদাশঙ্করের ছিল সাহিত্যরচনার তাগিদ। ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিও দেখেছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যে দেশ আর প্রদেশ দুভাগ হয়ে পূর্ববঙ্গ পড়বে পাকিস্থানে তা বুঝতে পারেননি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের লড়াই চলতেই থাকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় বড়োলাট 'অন্তবর্তী সরকার' গঠন করতে চাইলে লীগ সহযোগীতা করল না। মহঃ আলি জিন্না কেন্দ্রিয় সরকার গঠনে সহমত পোষণ করলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন ১৬ই আগস্ট Direct Action ঘোষণা করতে হবে। মুসলিম লীগকে দিয়ে তিনি Direct Action প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জটিল কারণ কংগ্রেস নেতারা তাঁর সঙ্গে কোয়ালিশন না করে প্রাদেশিক সরকার ছেড়ে চলে যান। তিনি বুঝতে পারলেন কোয়ালিশন করা কংগ্রেসের পলিসি নয়। জিন্নার অনড় দাবি। মি. অ্যাটলির ঘোষণা ও মাউন্টব্যাটেনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ও ব্রিটেনের ভারত ত্যাগ কার্য সম্পন্ন হয়। হিন্দুস্থান নামের পরিবর্তে হল ইণ্ডিয়া। দেশ খণ্ডন এই নীতিকে গান্ধীজি মহাভুল বললেন। তাঁর কাছে ভারত এক ও অবিভাজ্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার দিনে সকলের আনন্দের অন্তরালে গান্ধীজি উপবাস ব্রত পালন করছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় চোখের সামনে এই ইতিহাস রচনা হতে দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এটা একটা বৃহৎ জাতির পরাজয়। এই জাতীর পুনর্নবীকরণ দরকার। এই ভাবনা থেকেই *ক্রান্তদর্শী* উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। তাঁর বিচারে এই মহাদুর্ঘটনায় জাতীয়বাদী মুসলমানরাই হতভাগ্য। তাঁরা হিন্দুস্থান পাকিস্থান দুদিকেই বিশ্বাস হারালেন। দেশভাগ প্রদেশভাগে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও হিংসা বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে দলে দলে মানুষ ছুটবে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের তাতে বিপদ যা আজকেও ভুগতে হচ্ছে। স্বাধীনতা দিবসের এক সপ্তাহ

আগে অন্নদাশঙ্কর ময়মনসিংহ থেকে হাওড়া বদলি হন। বিদায় সভায় তিনি বলেন—

> ''পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোটো নৌকা! তাতে যাত্রীর সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেলে নৌকাডুবি ঘটবে।... পূর্ববঙ্গের সওয়াকোটি হিন্দুর জন্যে সেখানে ঠাঁই নেই। তারা সবাই গেলে পশ্চিমবঙ্গ ডুববে।''[৩১]

ভারত স্বাধীন হল। পাকিস্থান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। বঙ্গদেশ ভেঙে দ্বিধাবিভক্ত। অন্নদাশঙ্কর রায় হঠাৎ খবর পান গান্ধীজি নিহত। এর জন্য হিন্দু বাঙালি ঘরেও মিষ্টান্ন পরিবেশিত হচ্ছে। তিনি অবাক ও মর্মাহত—

> ''মাস খানেক বাদে তিরিশে জানুয়ারি। বিনা মেঘে বজ্রপাত। 'Mahatma Gandhi shot dead by a down-country Hindu.' আমি এই কোডেড (coded) টেলিগ্রাম দেখে ভয় পাই। হিন্দুটি বাঙালি নয় তো? পরবর্তী কোডেড টেলিগ্রাম 'Name of assassin Nathuram Godse.' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। পরদিন সকালে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল। খালি পায়ে আমিও হাঁটলুম সকলের সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে শুনলুম গত রাত্রে কয়েকটি সুপরিচিত হিন্দু পরিবারে মিষ্টান্ন পরিবেশন হয়েছে। গ্রাম অঞ্চল থেকেও মিষ্টান্ন বিতরণের খবর পেলুম। আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে আমি গান্ধীজির প্রিয় কর্ম যতটুকু পারি সম্পাদন করব। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি সাধন হবে আমারও প্রিয় কর্ম।''[৩২]

গান্ধীজি মৃত হলেও তাঁর কাছে জীবিত থেকে গেল। মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অন্নদাশঙ্করের। কিন্তু মতবিরোধ বাধল ড. বিধানচন্দ্র রায় গোপন বৈঠকে জানিয়ে দেন ওপারের হিন্দু বাঙালিদের সীমান্তে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর এপারের মুসলমানদের ওপারে তাড়িয়ে দিতে হবে। ইণ্ডিয়া রাজশাহী দখল করবে। তখন অন্নদাশঙ্কর হবে রাজশাহীর জেলাশাসক। কিন্তু তিনি যে ১১ বছর পূর্বেই রাজশাহীর জেলাশাসক ছিলেন এটা বোধ হয় ড. রায় জানতেন না। কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ থেকে মুসলমান বিতাড়নের এরকম নির্দেশ ছিল না। এ ঘটনায় অনেক রক্তপাত হবে বলে অন্নদাশঙ্কর রাজি হলেন না। তার প্রতিক্রিয়া—

> ''মন্ত্রী উত্তপ্ত হয়ে বললেন, 'আপনাকে পলিসি ঠিক করতে কে বলেছে? আমরাই পলিসি ঠিক করব। আপনি ক্যারি আউট করবেন কি করবেন না?'
>
> আমি বললুম, 'আমি ক্যারি আউট করব না। ইস্তফা দেব। I am a man with an all India reputation. Do you think I Shall starve?'

তখন মন্ত্রী বললেন, 'আপনি যেতে পারেন।"[৩৩]

আরও একটা বিপদ। মুখ্যমন্ত্রী কোনো লিখিত আদেশ দেবেন না। মৌখিক আদেশই মানতে হবে। অন্নদাশঙ্কর ভাবলেন—

> ''আমার ভাল করেই জানা ছিল যে সরকারি কর্মচারী যদি সরকারের আদেশ ক্যারি আউট না করে তো শাস্তি অবধারিত। কিন্তু সরকারি আদেশ পালন করতে গেলে যদি হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহারা হয় ও তাদের কারও কারও বল্লম বা শড়কির আঘাতে যদি এক জনও পুলিশ নিহত হয় তবে গোটা পুলিশবাহিনী আমার বিরুদ্ধে বি-বি-বিদ্রোহ করবে। আর পুলিশের গুলিতে যদি দশ জন মুসলমান নিহত হয় তো গোটা মুসলিম সমাজ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। আমিও প্রমাণ করতে পারতুম না, কর্তারাও স্বীকার করতেন না যে তাঁরা মৌখিক আদেশ দিয়েছিলেন। আমার চাকরিটাই যাবে। তার চেয়ে অনেক ভাল মানে মানে ইস্তফা দেওয়া।"[৩৪]

অন্যদিকে সাহিত্যচর্চা অথৈ জলে। তিনি যে একজন সাহিত্যিক সেটা প্রমাণ করতে পারছিলেন না। তিনি ভাবলেন আমার জায়গায় সরকারি কাজ করার জন্য আরও অনেক যোগ্য লোক আছেন। কিন্তু তিনি যে সব বই লিখতে চান সে সব লেখার মতো কেউ নেই। তিনি না লিখলে সেই সব মূল্যবান উপন্যাস, প্রবন্ধ অলেখাই থেকে যেত। সুতরাং বল ও বয়স থাকতেই অবসর নিতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে মনোস্থির করেন সরকারের অন্যায় আদেশ পালন করবেন না। অন্যদিকে অবসরও দরকার। সাধ্যমত জীবনশিল্পীর দায়িত্ব মেটানোর তাগিদ। অন্নদাশঙ্কর মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ পালন না করায় অপসারিত হতে হল। তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনভাবে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্ত্রী লীলা রায়ও তা সমর্থন করলেন। তাঁকে অনুরোধ করা হল কিছুদিনের জন্য জুডিসিয়াল সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করতে। এই পদে ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মেয়াদ শেষের ১৩ বছর পূর্বে চাকরি থেকে অব্যাহতি পেলেন। পরবর্তীতে ড. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অবসরের পর তিনি শান্তিনিকেতনে থাকাই মনস্থির করলেন।

জীবনে আর একটি পর্ব শুরু হল। শান্তিনিকেতনে স্বাধীন ও সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হলেন। বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রার পদে চাকরির জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে সাহিত্য সাধানায় নিমগ্ন থাকবেন বলে সম্মতি দিলেন না। তিনি অবশ্য বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে এই সদস্যপদ থেকেও সরে আসেন। তিনি যেন এতদিনে দ্বিতীয় যৌবনে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল—

''আমার যৌবন সায়াহ্ন শেষ হয়ে এসেছিল। এখন আমি চাই দ্বিতীয় যৌবন। যেমন চেয়েছিলেন আমার অন্যতম গুরু প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় যৌবনেই তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূরণ হয়। তিনি সম্পাদনা করেন 'সবুজপত্র', রচনা করেন 'চার ইয়ারী কথা', বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক।

আমারও বিশ্বাস ছিল আমিও লিখতে পারব একখানি কি দুখানি ক্লাসিক। যদি অখণ্ড মনোযোগ দিই। 'সত্যাসত্য' রচনার সময় সেটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। এইবার তো আমি জীবিকার দায় থেকে মুক্ত। এখন আমার দায় বলতে রূপের দায়, রসের দায়। অর্থাৎ আর্টের দায়, প্রেমের দায়।''[৩৫]

রূপ-রসের সাধনায় নিমগ্ন হয়ে অফুরন্ত উদ্যম ও ভালোবাসায় লিখে চললেন উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, ছড়া। একাগ্র মনোযোগে লিখে ফেললেন উপন্যাসের মধ্যে *না, কন্যা, রত্ন ও শ্রীমতী*-র প্রথম দুটি ভাগ। যতই ছাড়াতে চায় ততই জড়ায়ে ধরে পায়। তাঁর এরকম অবস্থা। প্রশাসক হিসেবে প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য তাঁকে দিল্লীতে গঠিত সাহিত্য আকাদেমির সদস্য করা হল। আবার সংসদের সদস্যরা তাঁকে ওই আকাদেমির কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু তিনি একান্তভাবে সাহিত্য সাধানায় নিমগ্ন থাকবেন বলে কিছু দিনের মধ্যেই সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তিনি সত্যের পূজারি। কালজয়ী উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে সত্যের অন্বেষণ করবেন। শান্তিনিকেতনে বসে সেই প্রচেষ্টা চলছিল। শান্তিনিকেতন সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্র। সারাবিশ্বের সাংস্কৃতিক মিলন সেখানে ঘটেছে। স্বাধীনতার পর ওপার বাংলার কবি সাহিত্যিকদের ও সাধারণ মানুষদের তিনি ভুলতে পারেননি। শানিকেতনে সাহিত্যমেলার প্রতিষ্ঠা ওপার বাংলা এপার বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের এক জায়গায় সমবেত করার প্রচেষ্টা চলছিল। ওপার বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি অন্নদাশঙ্করের একটু সমবেদনা, সহানুভূতি ছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন ওপার বাংলায় অকাদেমি যে পরিমাণ কাজ করে পশ্চিমবঙ্গে সেরকম কোনও আকাদেমি নেই। প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে শান্তিনিকেতনে সকলের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ সুযোগ ছিল। তিনি এখন বিচারক নন সাহিত্যিক, সকলের বন্ধু। শান্তিনিকেতনে ১৬ বছর ধরে সাহিত্যের ফসল ফলানোর পর কলকাতায় চলে যেতে হয়। স্ত্রী লীলা রায়ের অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ সাল থেকে চিকিৎসার সুবিধার্থে কলকাতায় থাকতে হল। কলকাতার বাস আর একদিক থেকে মঙ্গলই হল। স্বামী-স্ত্রী নানা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। এপার ও ওপার বাংলার সংযোগ, ভাষাচর্চা, ওপার বাংলার বই সহজেই পাওয়া গেল। বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধ ভাবিত করে তুলেছিল। বাঙালিদের আরও রক্ত ঝরবে বলে তিনি বেদনাহত। পাকিস্থান সরকারের বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করা মেনে নিতে পারেননি। অন্নদাশঙ্কর তাই মনোজ বসু ও নীহাররঞ্জন রায়ের মতো বিশিষ্ট লেখকদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উৎসাহিত করার জন্য সমর্থন জানান। এই সময় তিনি লেখেন *বাংলার রেনেসাঁস, বাংলাদেশে, কাঁদো, প্রিয়দেশ* প্রভৃতি প্রবন্ধ, *তৃষ্ণার জল, বিশল্যকরণী, রত্ন ও শ্রীমতী* তৃতীয় ভাগ প্রভৃতি উপন্যাস। নকশাল আন্দোলন নিয়েও তিনি যথেষ্ট ভেবেছিলেন। তিনি মনে করতেন নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। রেভোলিউশন কথাটির বিপরীত কাউন্টার-রিভোলিউশন। একটি হলে অন্যটি অপরিহার্য। সেটা এড়াতে হলে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করতে হবে। সেই শব্দটি রিনিউয়াল বা পুনর্নবীকরণ। দেশ রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতায় ন্যায়-নীতির দাবি বজায় রাখতে পুনর্নবীকরণের কথা চিন্তা করেন। তাঁর *কাঁদো, প্রিয়দেশ* গ্রন্থ প্রকাশে রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকার বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে। এই গ্রন্থ ছাপা হলে নাকি বাংলাদেশ থেকে এক কোটি শরণার্থী এসে পশ্চিমবঙ্গে হাজির হবে। তাঁর কলমের এত জোর তিনি জানতেন না। রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। কীভাবে এসবের সমাধান হবে ভাবতে ভাবতে একটি বড় উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি নেন যার থিম হবে রিনিউয়াল বা পুনর্নবীকরণ। এটিই তাঁর শেষ ও তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাস। চার খণ্ডে সমাপ্ত। নাম *ক্রান্তদর্শী* যা ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালে লেখা হয়। এই উপন্যাসটি তাঁর পরমতৃপ্তির সম্পদ। জীবন নিঃশেষ হওয়ার আগে আজীবন কামনার ধন।

দীর্ঘজীবনে বহু অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ অন্নদাশঙ্কর জীবনপ্রবাহে এগিয়ে চলার সাথে সাথে উপন্যাসকেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। উপন্যাস সম্পর্কে তিনি কিছু নিজস্ব ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অবশ্যই মূল্যবান। তিনি দেখেছেন বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ লেখকেরা সত্য ঘটনা সুন্দর করে লিখতে জানেন না। লেখা যে একটা আর্ট এটাও তারা শিখবে না। লেখা হয়েছে একটা ইন্ডাস্ট্রি। একসময় বুর্জোয়াদের জন্য বুর্জোয়ারাই লিখেছেন উপন্যাস। পাঠকের চাহিদা অনুসারে লেখককেও লিখতে হয়; না হলে লেখকের দুর্গতি। বইও পাঠক সমাদর করেন না। শ্রমিক বা সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনকাহিনি নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে। কিন্তু লেখক ওদের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হতে পারেনি। ফলস্বরূপ চরিত্রগুলি যেন মন খুলতে পারেনি। তিনি বলেছেন—

‘‘পরের বিষয়ে কৌতূহল সহজেই বাসি হয়ে যায়, যদি না পরকে আপন করার

কৌশল জানা থাকে। তার মানে প্রোলিটারিয়ানের অন্তরে যে শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষটি আছে তার সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। এ ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেই কাবুলিওয়ালা বাঙালীর আপন লোক হয়েছে। এ ক্ষমতা যাঁদের নেই তাঁরা হয়তো কাবুলিকে বাঙালী করে তুলবেন, কিন্তু কাবুলিকে কাবুলি রেখে বাঙালীর ঘরের লোক করতে পারবেন না। তেমনি চাষীকে ভদ্রলোক করে বসবেন, কিন্তু চাষীকে চাষা রেখে আত্মীয় করতে অক্ষম হবেন।''[৩৬]

তৃষ্ণার জল উপন্যাসে প্রবাহন উপন্যাস লেখে। হেমন্তবাবু প্রবাহনকে বোঝাতে চান উপন্যাসে একটি কাহিনি থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে সত্যও—

''লোক তোমার কাছে চাইবে স্টোরি। স্টোরি যদি দিতে না পারো কাছে ঘেঁষবে না। তখন তোমার সত্য নিয়ে তুমি করবে কী? শিকেয় তুলে রাখবে? না, প্রবাহন, তুমি স্টোরিও দেবে সত্যও দেবে। ময়রা যেমন রসও দেয়, গোল্লাও দেয়। উপন্যাস হচ্ছে সুস্বাদু ও সুপরিপাচ্য রসগোল্লা।''[৩৭]

আসলে তিনি চান উপন্যাসে লেখা হোক শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষের কাহিনি। উপন্যাস হচ্ছে একটা আর্ট। শুধু পাঠকের কৌতূহল সাময়িকভাবে চরিতার্থ করবার জন্য নয়। পাঠকের কৌতূহল টেনে নিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। লেখককে এমন কিছু হাতে রাখতে হয় যার জন্য পাঠকের কাছে কাহিনি কৌতূহলবশত শেষ হবে না। অমোঘ আকর্ষণে পাঠক চালিত হবে। *তৃষ্ণার জল* উপন্যাসে হেমন্তবাবু প্রবাহনকে বলে—

''উপন্যাস যখন লিখতে বসবে তখন মনে রাখবে যে, সব সময় কিছু হাতে রাখতে হয়। আরব্য উপন্যাসের শেহেবজাদীর মতো। রাত ফুরোবে, কিন্তু কাহিনী ফুরোবে না। পাঠকের কৌতূহল গোড়ায় যেমন ছিল শেষেও তেমনি থাকবে। তাকে আবার শুনতে হবে।''[৩৮]

তাহলে উপন্যাসের অভাব না ঔপ্যাসিকের অভাব? ধর্ম ধর্মজ্ঞান, নীতি-অনীতিবোধ, রুচি-অরুচি বিচারের মানদণ্ডে একটি উপন্যাসের ভালোমন্দ যাচাই করার ক্ষমতা থাকা চাই। আর তা না হলে বই লেখা হবে বিস্তর কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারে এমন বই মিলবে না। অন্নদাশঙ্কর রায় বিরাট এপিক উপন্যাস লেখার চেষ্টায় ছিলেন। উপন্যাস রচনার একটা সাধানা আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থাকলেই হয় না লিখনের অভিজ্ঞাতাও থাকা চাই। কিছু লিপিকুশলতা অর্জন করে বড়ো মাপের উপন্যাস রচনা করা যায় না। উপন্যাস একপ্রকার গঠনকর্ম। গঠনের কাজ দিনের পর দিন করে যেতে হয়।

এর জন্য চাই ধৈর্য্য, নিরলস প্রচেষ্টা। জীবনের অভিজ্ঞতা বা জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে গরম গরম উপন্যাসে তুলে আনা যায় না। উপন্যাসের বেলা জুড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। না জুড়ালে হবে একটা রিপোর্ট, উপন্যাস নয়। এর জন্য কালের ব্যবধান দরকার। তিনি বলেছেন—

> ''উপন্যাসের বেলা জুড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। কাল তোমার জীবনে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে বলে আজ তুমি উপন্যাস লিখতে বসে যাবে এটা হবার নয়। লিখতে গেলে দেখবে উপন্যাস হয়ে উঠছে না, হয়ে উঠছে রিপোর্ট। মহাযুদ্ধের পর বহু দশক অতিক্রান্ত হলে তার সম্বন্ধে সার্থক উপন্যাস রচিত হয়। বিপ্লব সম্বন্ধেও। কালের ব্যবধান উপন্যাসের বেলা অপরিহার্য প্রয়োজন। তার ফলে রস তেমন ঘন হয় না, অনুভূতি তীব্রতা হারায়। কিন্তু উপন্যাস তো কবিতা নয়। কবিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তার কাজ নয়। তুমি যদি অপেক্ষা করতে না চাও তবে কবিতা লেখ। আর যদি মনে হয় উপন্যাস না লিখে তোমার শান্তি নেই তবে দীর্ঘ জীবনের জন্যে প্রার্থনা করো। হয়তো শেষ দেখে যেতে পারবে না, তবু ঘোড়দৌড়ের মতো কলম চালিয়ে যেয়ো না। উপন্যাসের বেলা খরগোশদের জিৎ নয়, কচ্ছপদের জিৎ।''[৩৯]

সেই সঙ্গে উপন্যাস রচনার জন্য চাই অন্তর্দৃষ্টি। এর জন্য তিনি তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাসকে নিজেই অনুমোদন করেননি। তিনি *ক্রান্তদর্শী* উপন্যাসের প্রথম পর্বের ভূমিকায় লিখেছেন—

> ''বারো বছর ধরে সত্যাসত্য লিখে আমি সম্পূর্ণ শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিঃশেষিত হয়ে পড়ি। আরো বারো তেরো বছর অপেক্ষা না করে বড়ো মাপের উপন্যাস লেখার মতো দম পাইনে। বড়ো মাপের উপন্যাস রচনা যেন একটা দীর্ঘ পদযাত্রা। 'রত্ন ও শ্রীমতী' তো পাঁচ বছরের মধ্যেই পাঁচখণ্ডে সারা হবে ভেবেছিলুম। কিন্তু শেষ করতে চোদ্দ বছর লাগল।''[৪০]

লেখকের রচিত কালের ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা উপন্যাসে কাহিনি ও চরিত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হয়। লেখকের কথায়—

> ''উপন্যাস লেখাও একটা নিরুদ্দেশযাত্রা। এটা ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। আরম্ভের পূর্বে এর থীম্ ছিল রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। লিখতে লিখতে তার থেকে সরে এসেছি। উপন্যাস তার নিজের নিয়মেই চলে। আমাকেও সে নিয়ম মানতে হবে।''[৪১]

অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা বিল্ডিং নির্মাণ করা বা থিসিস লেখা যায়। কিন্তু আগাগোড়া বেঁধে পরিকল্পনা করে উপন্যাস লিখতে গেলে অনেক সময় স্বাধীনভাবে চরিত্রগুলির অন্তর্জীবন প্রকাশ পায় না। জীবনের শেষ পর্বে এসে নিজের মনের কথার সঙ্গে চরিত্রের মনের কথাও পাঠকদের জানিয়েছেন—

> ''পরিকল্পনা অনুযায়ী থীসিস লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমারোহ। তারা বলে, ''আমরা কি তোমার হাতের পুতুল যে তোমার খুশিমতো নড়ব চড়ব নাচব? আমাদের খুশিমতো আমরা বাঁচব।''[৪২]

অন্নদাশঙ্কর রায় জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যের জগতে খুশিমত বেঁচেছেন। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের স্বাদগ্রহণ করে একই সঙ্গে অনুভব করেছেন উভয় সত্যকে। একদিকে তিনি মননের শিখরে উঠে মহাশূন্যের স্পর্শ পেয়েছেন, মননকে ছাড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে যুক্তির ভূমিদেশ ছাড়িয়ে শিল্পলোকের অতলে প্রবেশ করেছেন। এইভাবে একই সঙ্গে উপরে উঠেছেন ও গভীরে নেমেছেন। জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কৃত হয়েছেন বহুবার। *পথে প্রবাসে*-র পর ১৯৫৭ সালের জাপান যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা *জাপানে* গ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬২ সালে। ১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করেছিল জগত্তারিণী পুরস্কার। বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮০ সালে। রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন *নব্বই পেরিয়ে* গ্রন্থের জন্য। মহাত্মা শিশিরকুমার পুরস্কার পেয়েছেন। আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন— দুইবার—১৯৮৩ সালে ও ১৯৯৪ সালে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অন্নদাশঙ্করকে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করেছে। জাতীয় সম্মান 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। শিরোমণি পুরস্কারে পুরস্কৃত হন ১৯৯৫ সালে। তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট প্রদান করেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সম্মানজনক জইবুন্নিসা পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। সাহিত্য অকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ফেলো ছিলেন। এক সময় ছিলেন রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার কমিটির সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির সাফল্য সূচিত হয়েছে তাঁর প্রচেষ্টা ও উপদেশ গ্রহণ করে। *ক্রান্তদর্শী* উপন্যাস লিখে তিনি ক্রান্তদর্শী নামে পরিচিত হয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর যে দায়বদ্ধতা নিয়ে শিল্পের সাধনা করে যান, আর্টের জন্য যার আজীবন ব্যাকুলতা সেই জীবন মহাকালের নিয়মে এক সময় ক্ষীণ হয়ে আসে। শারীরিক দক্ষতা কমে আসতে থাকে। যিনি মহীরুহের মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নিয়ে জীবনের পথ হেঁটেছেন তাঁর অন্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। অন্তরে এক জীর্ণ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। আসবে কী সেই মুক্তির নীরবতা? জীবন ও শিল্পের

জয়গান গাওয়া মানুষটির জীবনে সেই মুক্তির নীরবতা নেমে এল ২০০২ সালের ২৮ শে অক্টোবর।

তথ্যসূত্র:

১. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৩

২. ঐ - পৃ. ৪০

৩. ঐ - পৃ. ২৪

৪. ঐ - পৃ. ৩৩

৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ২৬১, ২৬২

৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫৪

৭. ঐ - পৃ. ৫৫

৮. রায় অন্নদাশঙ্কর - অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, লেখকের ভূমিকা, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৬৭

১০. রায়চোধুরী সব্যসাচী - অন্নদাশঙ্কর রায়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩৩

১১. ঐ - পৃ. ৩৫

১২. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৬৪

১৩. ঐ - পৃ. ৬২, ৬৩

১৪. ঐ - পৃ. ৬৮

১৫. ঐ - পৃ. ৬৮

১৬. ঐ - পৃ. ৭১

১৭. মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.) সমকালের জিয়ন কাঠি (বিশেষ সংখ্যা অন্নদাশঙ্কর রায়),

প্রকাশিত জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃ. ৭৬

১৮. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৮০

১৯. ঐ - পৃ. ৮৩, ৮৪

২০. ঐ - পৃ. ৮৬

২১. রায়চোধুরী সব্যসাচী - অন্নদাশঙ্কর রায়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৪৬

২২. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৯২, ৯৩

২৩. ঐ - পৃ. ৯৯

২৪. ঐ - পৃ. ১১৮, ১১৯

২৫. ঐ - পৃ. ১১৯

২৬. ঐ - পৃ. ১২১

২৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশ গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১১৫, ১১৬

২৮. রায়চোধুরী সব্যসাচী - অন্নদাশঙ্কর রায়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৫৭

২৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১৩০

৩০. ঐ - পৃ. ১৩৫

৩১. রায়চোধুরী সব্যসাচী - অন্নদাশঙ্কর রায়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬১

৩২. রায় অন্নদাশঙ্কর - জীবন যৌবন, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১৬২

৩৩. ঐ - পৃ. ১৬৯

৩৪. ঐ - পৃ. ১৭১

৩৫. ঐ - পৃ. ১৮৪

৩৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৩৯

৩৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৫

৩৮. ঐ - পৃ. ২০

৩৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৪১

৪০. রায় অন্নদাশঙ্কর - অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৫

৪১. ঐ - পৃ. ২১১

৪২. রায় অন্নদাশঙ্কর - অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৯১